মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা

উপস্থাপনায়

কামরুল হাসান

সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার

ইসলামপুর, জামালপুর।

মাছ চাষের গুরুত্ব

১. পুষ্টিগত গুরুত্ব:

২. অর্থনৈতিক গুরুত্ব:

- প্রত্যক্ষ লাভ
- পরোক্ষ লাভ

পুকুর প্রস্তুতি

পুকুর: পুকুর হলো পানির আধার। পানি হলো মাছের বাসস্থান। অতএব, ভাল গুণাবলী সম্পন্ন পুকুরই হলো মাছ চাষের পূর্বশর্ত।

একটি ভাল পুকুরের বৈশিষ্ট :

১। আকার : খুব ছোট বা বড় হবে না। ৫০ – ১০০ শতাংশ হলে ভাল।

২। গভীরতা: গড় গভীরতা ১.৫ – ২ মিটার বা ৬ ফুট হওয়া ভাল।

৩। আলো: দিনে কমপক্ষে ৬ ঘন্টা আলো পড়তে হবে।

৪। অস্বচ্ছতা: প্লাংক্টনের উপস্থিতির জন্য পানি অস্বচ্ছ হবে কিন্তু কাদার জন্য পানি অস্বচ্ছ বা ঘোলা হলে তা হবে ক্ষতিকারক।

৫। দ্রবীভূত অক্সিজেন: ৫-৮ পিপিএম দ্রবীভূত অক্সিজেন থাকতে হবে।

৬। পি.এইচ: ৬.৫-৮.৫ রাখা ভাল।

১. পুকুরের পাড় ও তলা ঠিক করা

প্রয়োজনীয়তা:

১। বন্যার পানি বা অত্যধিক বৃষ্টিতে পুকুর ডুবে যাবে না ।

২। পাশের জমি থেকে বিষ ছিটানো পানি পুকুরে ঢুকতে পারবে না ।

৩। ইঁদুরের গর্ত দিয়ে ছোট মাছ ঢুকে পুকুরে মাছের সংখ্যা বেশি হবে না ।

৪। বাইরের পানির সাথে রোগ বালাই সহজে পুকুরে ঢুকতে পারবে না ।

৫। পুকুরের পাড় ভেঙ্গে খুব খাড়া হয়ে গেলে মাছের উৎপাদন কম হতে পারে ।

৬। পুকুরের তলায় বেশি কাদা হলে তা মাছের জন্য ক্ষতিকর ।

৭। পুকুরের তলা সমান থাকলে জাল টানতে এবং মাছ ধরতে সুবিধা হয় ।

৮। মাছের জন্য ক্ষতিকর প্রাণি যেমন সাপ, উদবিড়াল ইত্যাদি ঝোপঝাড়ে আশ্রয় নিতে পারবে না

৯। বড় গাছের ডালপালা ছাটলে পুকুরের পানিতে সূর্যের আলো বেশি পড়বে ও লতাপাতা পঁচে পানি দূষিত হবে ন।

পুকুরের পাড় ও তলা ঠিক করা

পুকুরের কাদার উপকারিতা ও অপকারিতা

উপকারিতা:

কাদার মধ্যে বেশ পরিমাণে জৈব পদার্থ(হিউমাস আকারে) থাকে যা পানির ধারণ ক্ষমতা বাড়ায় ।

অপকারিতা:

বেশি পরিমাণে কাদা থাকলে পানির অক্সিজেন কমে যায় এবং পানিতে বিষাক্ত গ্যাস সৃষ্টি হয় । ফলে পুকুরের পরিবেশ নষ্ট হয়, মাছের উৎপাদন কম হয় । পুকুরের তলদেশে এক ফুটের বেশি কাদা থাকা উচিত নয় ।

পুকুরের পরিমাপ:

পুকুরের প্রকৃত পানির আয়তন = (পাড়সহ পুকুরের আয়তন – পাড়ছাড়া আয়তন) বর্গ একক

আয়তন = (দৈর্ঘ্য * প্রস্থ) বর্গ একক

বর্গ ফুট/৪৩৫.৬ = শতাংশ

২. আগাছা দমন

আগাছা: যে সব জলজ উদ্ভিদ মাছ চাষের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাদেরকে আগাছা বলে ।

পুকুরের আগাছাসমূহ :

১। ভাসমান- কচুরীপানা, টোপাপানা, ক্ষুদিপানা ।

২। লতানো- মালঞ্চ, হেলেঞ্চা, কলমিলতা ইত্যাদি ।

৩। নিমজ্জিত- নাজাস, ঝাঁঝি ।

৪। নির্গমনশীল- আড়াইল, শুশনীশাক ইত্যাদি ।

আগাছার অপকারিতা :

১। আগাছা পানির পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে ফলে মাছের উৎপাদন কমে যায় ।

২। পানিতে সূর্যের আলো প্রবেশে বাধাঁ সৃষ্টি করে ফলে সালোকসংশ্লেষন হয় না ও প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয় না ।

৩। সূর্যের আলো প্রবেশে বাধা পায় ফলে পানির তাপমাত্রা কম থাকে ।

৪। মাছের শত্রু যেমন- শাপ, ব্যাঙ ইত্যাদি আগাছার মধ্যে লুকিয়ে থাকে এবং মাছ ধরে খায় ।

৫। আগাছা মাছের স্বাভাবিক চলাচলে বাধা দেয় ।

আগাছা দমন পদ্ধতি :

১। কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা আগাছা তুলে ফেলতে হবে ।

২। ঘাস খায় এমন মাছ ছেড়ে জৈবিক পদ্ধতিতে আগাছা দমন করা যেতে পারে ।

পুকুরের আগাছা পরিস্কার করা

৩. রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূরীকরণ

রাক্ষুসে মাছঃ

যে সকল মাছ অন্য মাছ/চাষকৃত মাছ কে সরাসরি খেয়ে ফেলে এদেরকে রাক্ষুসে মাছ বলে ।

যেমন- বোয়াল, শোল, গজার, টাকি, চিতল, ফলি, কাকিলা, মাগুর, আইর,পিরানহা, চ্যাঙ প্রভৃতি । গুইসাপ, উদ, কচ্ছপ ও মাছরাঙা এরাও মাছ খায় ।

অবাঞ্ছিত মাছঃ

যে সকল মাছ চাষকৃত মাছকে সরাসরি না খেলেও খাদ্য, বাসস্থান, অক্সিজেন ইত্যাদি নিয়ে চাষকৃত মাছের সাথে প্রতিযোগিতা করে এদেরকে অবাঞ্ছিত মাছ বলে ।

যেমন-মলা, চেলা, ডেলা,পুটি, চান্দা, চাপিলা, ছোট ইচা, ডারকিনা ইত্যাদি ।

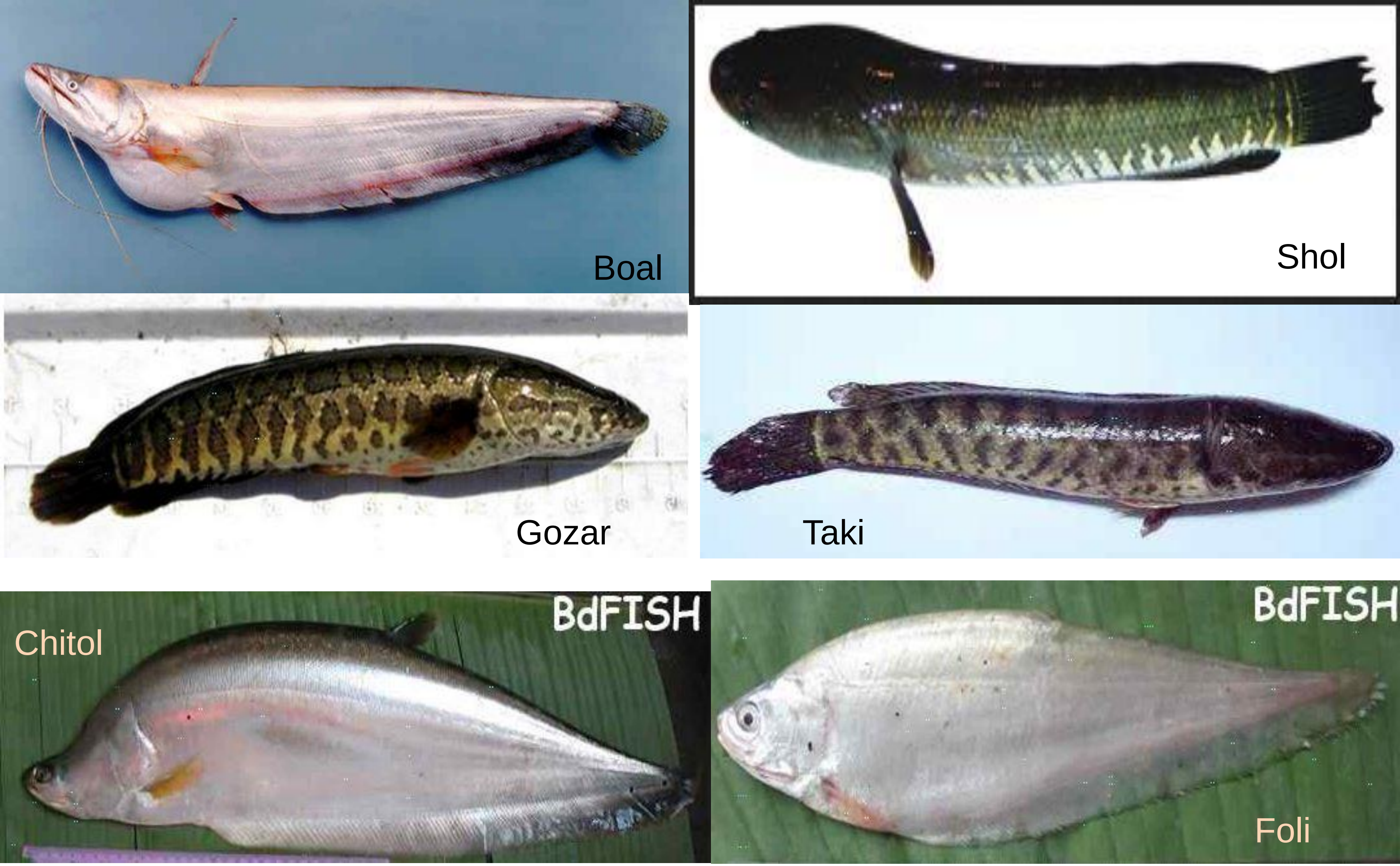

রাক্ষুসে মাছ

রাক্ষুসে মাছ

অবাঞ্ছিত মাছ

রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূরীকরণের প্রয়োজনীয়তাঃ

১। চাষ করা মাছের সাথে খাদ্য, অক্সিজেন, বাসস্থান ইত্যাদি নিয়ে প্রতিযোগিতা করে ।

২। পুকুরে মাছের সংখ্যা বাড়িয়ে দেয় এবং রোগ বালাই আনতে সহায়তা করে ।

৩। রাক্ষুসে মাছ, চাষ করা মাছের ছোট পোনা খেয়ে ফেলে ।

রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূরীকরণের পদ্ধতি :

১। পুকুর শুকিয়ে

২। রোটেনন প্রয়োগ করে

৩। বার বার জাল টেনে

৪। বড়শি দিয়ে

রোটেনন প্রয়োগ

ব্যবহার মাত্রা: ২৫ গ্রাম/ফুট/শতাংশ ।

রোটেননের পরিমাণ = ২৫ * পুকুরের আয়তন (শতাংশ) * পুকুরের গভীরতা (ফুট) গ্রাম

ব্যবহার পদ্ধতি:

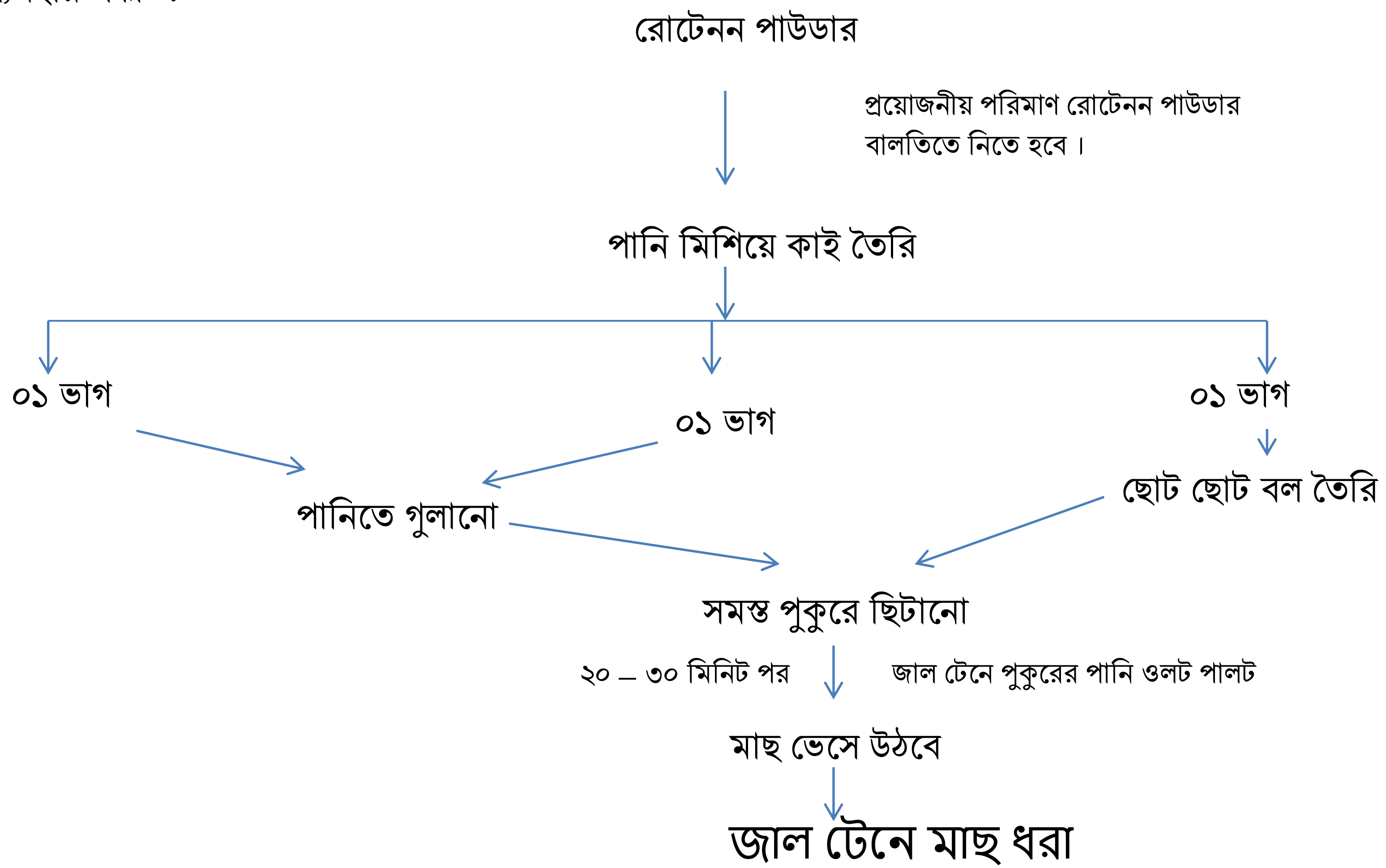

রোটেনন ব্যবহারে সতর্কতাঃ

১। গামছা দিয়ে মুখ বেধেঁ নিতে হবে ।

২। বাতাসের অনুকূলে রোটেনন ছিটাতে হবে ।

৩। মেঘলা দিনে অথবা ঠান্ডা আবহাওয়ায় রোটেনন ব্যবহার করলে ভাল ফলাফল পাওয়া যায় না ।

৪। ব্যবহারের শেষে পরিস্কার পানি দিয়ে হাত, মুখ ভালভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে ।

৫। রোটেনন সর্বদা শিশুদের নাগালের বাহিরে রাখতে হবে ।

৪. চুন প্রয়োগ

উপকারিতা:

১. মাটি ও পানিতে বিদ্যমান ক্ষতিকর জীবাণু সমূহ মারা যায় ।

২. মাছের রোগ বালাই দূর করে ।

৩. পানির ঘোলাত্ব দূর করে ।

৪. পরজীবী, ব্যকটেরিয়া এবং তাদের মাধ্যমিক পোষক মারা যায় ।

৫. চুনের ক্যালসিয়াম চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে ।

৬. মাটি ও পানির অম্লতা দূর করে পানিকে ক্ষারীয় রাখে ।

৭. সারের কার্যকারীতা বাড়ায় ।

৮. ক্ষতরোগের প্রতিরোধক হিসাবে কাজ করে ।

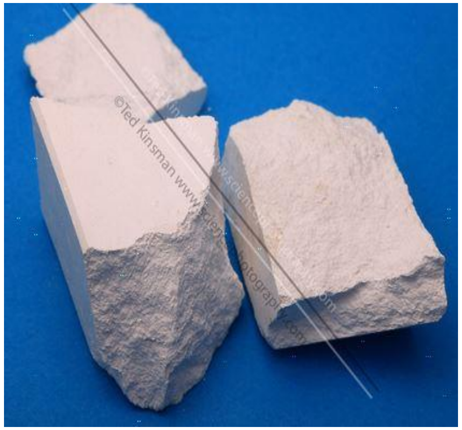

পাথুরে চুন

প্রয়োগ মাত্রাঃ

প্রতি শতাংশে ১ কেজি (নতুন পুকুরের জন্য)

প্রতি শতাংশে ২ কেজি (পুরাতন পুকুরের জন্য)

চুন প্রয়োগ পদ্ধতি

শুকনা ও ভেজা পুকুর	পানি ভর্তি পুকুর
↓	↓
প্রয়োজনীয় চুন গুড়া করতে হবে	প্রয়োজনীয় চুন মাটির পাত্র বা ড্রামে গুলাতে হবে
↓	↓ গরম চুন ঠান্ডা হওয়ার পর
ঢালসহ সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে	ঢালসহ সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে

- চুন গুড়া করে দেওয়ার চেয়ে পানিতে গুলিয়ে দেওয়া উত্তম। শুকনা পুকুরে চুন গুড়া করে দিলে অনেক সময় বাতাসে উড়ে যায়।
- মাছের রোগ প্রতিরোধের জন্য শীতের আগ কার্তিক মাসে শতকে ১ কেজি চুন দিতে হয়।

চুন প্রয়োগের সময়:

১. রোটেনন প্রয়োগের ৭ দিন পর

২. পুকুরে সার প্রয়োগের ৭ দিন আগে

৩. কড়া রোদে চুন প্রয়োগ করলে ভাল ফলাফল পাওয়া যায় ।

চুন প্রয়োগে সতর্কতা :

১. প্লাষ্টিকের বালতিতে চুন গুলানো যাবে না ।

২. পাত্রে পানি নিয়ে পানির মধ্যে চুন দিতে হবে ।

৩. পানি ভর্তি পুকুরে গরম চুন প্রয়োগ করা যাবে না ।

৪. পুকুরে মাছ থাকা অবস্থায় বিশেষ করে পোণা থাকা অবস্থায় কখনও সরাসরি চুন (দলা অবস্থায়) দিবেন না । অবশ্যই চুন পানিতে গুলিয়ে, ঠান্ডা করে পুকুরে ছিটাবেন ।

৫. পুকুরে মাছ থাকা অবস্থায় খুব বেশি পরিমাণে চুন প্রয়োগ করতে হলে তা দুই তিন ভাগ করে দেবেন ।

৬. বতাসের অনুকূলে ছিটাতে হবে ।

৭. চুন ব্যবহারের সময় নাক – মুখ গামছা দিয়ে বেঁধে নিতে হবে ।

৮. চুন শিশুদের নাগালের বাহিরে রাখিতে হবে ।

৫. সার প্রয়োগ

(নার্সারী পুকুরের ক্ষেত্রে শুধু ১৫ কেজি/বিঘা সরিষার খৈল সার হিসাবে ব্যবহার করতে হবে)(নার্সারীর ক্ষেত্রে হাসপোকা দমনের জন্য মেজিক/রিপকর্ড ৪০ মিলি/বিগা/৪ফুট গভীরতা ২৪ ঘন্টা আুগে, সুমিথিয়ন ১০০ মিলি/বিঘা/ফুট, ৮ ঘন্টা আগে)(দুই ধাপ পদ্ধতিতে ১ কেজি/বিঘা, এক ধাপ পদ্ধতিতে ৬০০-৭০০ গ্রাম/বিঘা তবে ১৫-২০ দিন পর কিছু বিক্রি করতে হবে)(খাবার: ১ম তিন দিন ২গুন খাবার, তারপর ৩ দিন পর থেকে কিছু কিছু খাবার বাড়াতে হবে, যেমন ১ম তিন দিন ১ কেজি লাগলে তিন দিন পর ২ কেজি,এভাবে ১৫ দিন বয়সে ৫ কেজি পর্যন্ত দেওয়া যেতে পাবে) ১ম ৩ দিন মিহি আটা(ডিমের কুসুম মিশিয়ে দেওয়া যাতে পারে) দিতে হবে, ।(১ কেজি রেনুর জন্য ২ টি ডিমের কুসুম) তিন দিন পর থেকে সরিষার খৈল ১ম ৩ দিন রেনু কিনারায় থাকে তাি্ই খাবার কিনারায় দিতে হবে । ৭ দিন পর হাসপেকা দমনের জন্য আবার ম্যাজিক/রিপকর্ড ৪০ মিলি/বিঘা/৪ফুট) দিতে হবে)

১ কেজি রেনু = সর্বোচ্চ ২ লক্ষ্

১ কেজি ধানী = ৫০০০ টি

(

প্রয়োজনীয়তা:

- পুকুরে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনে সহায়তা করে ।

সারের প্রয়োগ মাত্রা:

সারের নাম	প্রয়োগ মাত্রা
ইউরিয়া	১০০-১৫০ গ্রাম/শতাংশ (৩০০ গ্রাম)
টিএসপি	৫০-৭৫ গ্রাম/শতাংশ 300 gm (১৫০ গ্রাম)
এমপি	৩০- ৩৫ গ্রাম/শতাংশ
কমপোস্ট	৮ – ১০ কেজি/শতাংশ

সার প্রয়োগ পদ্ধতি :

সার প্রয়োগ সময়ের ১২ ঘন্টা আগে টিএসপি সার পানিতে ভিজানো

↓

সার প্রয়োগ সময়ের আধা ঘন্টা আগে ইউরিয়া , এমপি ও টিএসপি এক সাথে পানিতে গুলানো

↓

সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটানো

ছবি-৭ ঃ পুকুরে ইউরিয়ার অর্ধেক টিএসপি দরকার

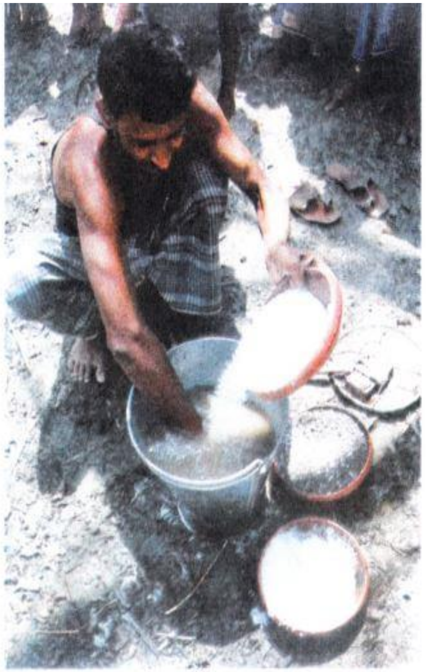

সার পানিতে গুলানো

সার প্রয়োগের সময় :

১. রোটেনন প্রয়োগের ৭ দিন পর

২. আলোক উজ্জ্বল দিনে

৩. মেঘলা দিনে সার প্রয়োগ না করাই ভাল ।

হাস পোকা, পুকুরের অন্যান্য পোকা দমন করার জন্য
রিপকর্ড 40 ml/bigha + proclaim 14 gm/bigha মিশ্রণ প্রয়োগ

পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা :

প্রাকৃতিক খাদ্য: মাটি ও পানির স্বাভাবিক উর্বরতায় কোন জলাশয়ে যে খাদ্য দ্রব্য উৎপাদিত হয় সেগুলোকে প্রাকৃতিক খাদ্য বলে ।

প্রাকৃতিক খাদ্য সমূহ :

১। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও প্রাণী কণা যা দেখতে সবুজ

২। ছোট ছোট কীটপতঙ্গ ইত্যাদি ।

প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা :

১। সেকী ডিস্ক ব্যবহার করে

২। হাতের সাহায্যে পুকুরের পানি পরীক্ষা

৩। গামছা গ্লাসের সাহায্যে পানি পরীক্ষা

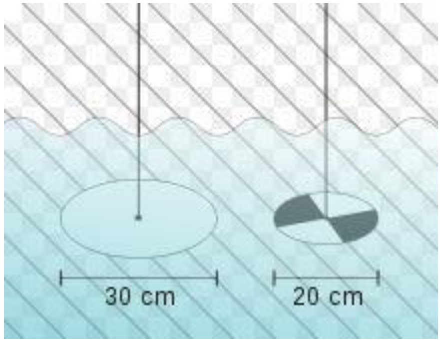

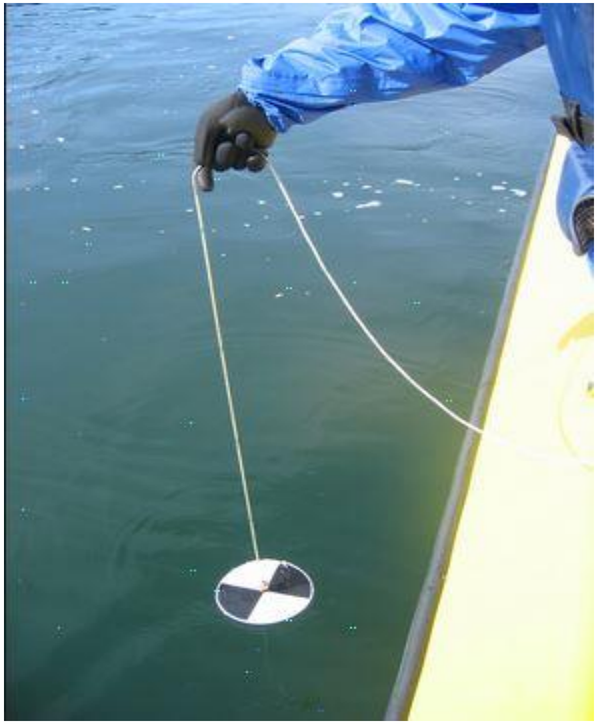

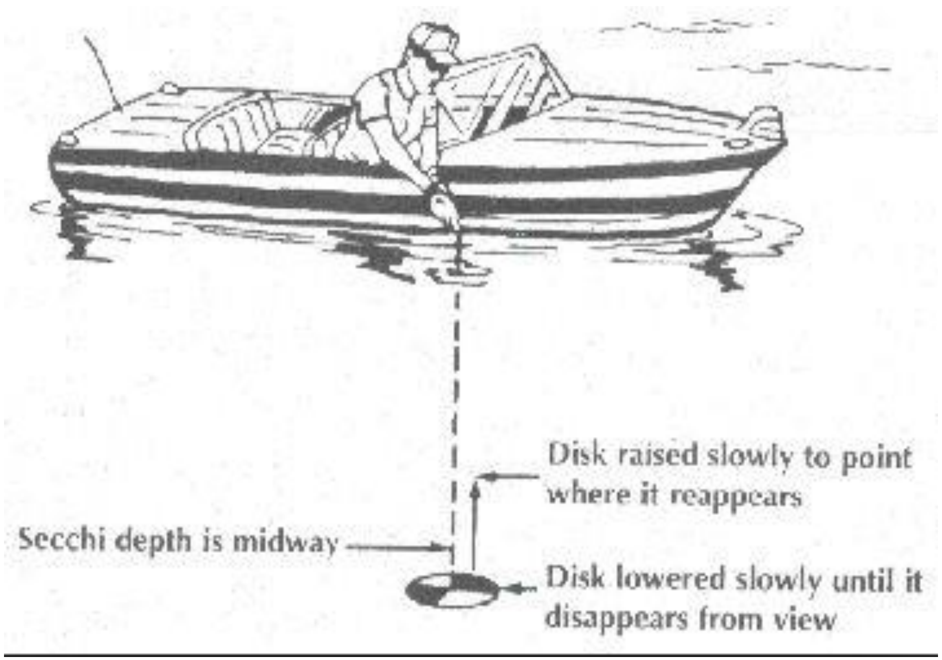

সেকি ডিস্ক পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা

গামছা গ্লাসের সাহায্যে পানিতে খাদ্য পরীক্ষা

হাতের সাহায্যে পানিতে খাদ্য পরীক্ষা

৬. মাছ চাষে মাটি ও পানির গুণাগুণ

মাটির গুণাগুণ:

- কাদা বা এটেল ও দোঁআশ মাটির পুকুর সবচেয়ে ভাল ।
- এ মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বেশি এবং প্লাংকটন ও বেনথোাস উৎপাদনের জন্য পুষ্টি সমৃদ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি করে ।

-বালি মাটি বা শুধু এটেল মাটি ভাল নয় ।

পানির গুণাগুণ

১। ভৌত গুণাবলী :

ক) গভীরতা-: ১.৫ – ২.০০ মিটার ।

খ) তাপমাত্রা: ২৫ – ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ।

গ) পানির অস্বচ্ছতা/ঘোলাত্ব: ভাল নয় ।

ঘ) আলো : পযাপ্ত আলো পড়তে হবে ।

২. রাসায়নিক গুণাবলী :

ক) দ্রবীভূত অক্সিজেন : ৫ – ৮ পিপিএম ।

খ) দ্রবীভূত কাবন ডাই অক্সাইড: ১২ পিপিএম এর বেশি ভাল নয় ।

গ) পি.এইচ : ৬.৫ – ৮.৫

৭. পোন মজুদকরণ

মিশ্র চাষের জন্য চাষযোগ্য কয়েকটি প্রজাতি:

মাছের প্রজাতি	পুকরের স্তর	প্রধান খাবার
কাত	উপরের স্তর	প্রাণী কণা , উদ্ভিদ কণা
সিলভার কার্প		উদ্ভিদ কণা
বিগহেড কার্প		উদ্ভিদ কণা
রুই	মধ্য স্তর	প্রাণী কণা , ক্ষুদ্র কীট ও শেওলা

মিশ্র চাষের জন্য চাষযোগ্য কয়েকটি প্রজাতি:

মাছের প্রজাতি	পুকরের স্তর	প্রধান খাবার
	নিম্ন স্তর	প্রাণী কণা, জৈব পদাথ, পুকুরের তলার কীট
		প্রাণী কণা, জৈব পদাথ, ছোট শামুক, পুকুরের তলার কীট
		প্রাণী কণা, জৈব পদাথ, পুকুরের তলার কীট, শেওলা
	সকল স্তর	জলজ উদ্ভিদ, নরম ঘাস,আগাছা, লতাপাতা, কলমিশাক, হেলেঞ্চা
		প্রাণী কণা, উদ্ভিদ কণা, ক্ষদিপানা, টোপাপানা, নরম ঘাস

মজুদ ঘনত্ব :

২-৫ কেজি পোনা/শতাংশ (প্রতিটি পোনার ওজন ২০০ -২৫০ গ্রাম)

১. কার্প মিশ্র চাষ

মাছের প্রজাতি	মজুদ ঘনত্ব/শতাংশ
কাতলা	২
সিলভার কার্প/বিগহেড কার্প	৪
রুই	৭
মৃগেল	৪
কমন কার্প	১
গ্রাস কার্প	১
মোট =	২০

মজুদ ঘনত্ব :

২. পাঙ্গাস (টি /শতাংশ)

মাছের প্রজাতি	সাইজ	পাঙ্গাস কাপ মিশ্র	পাঙ্গাস একক
পাঙ্গাস	৫-৬ ইঞ্চি/৩০ ৩৫ গ্রাম	৭০	১৫০ - ২০০
সিলভার/কাতলা/বিগহেড	৫-৬ ইঞ্চি	২০	
রুই	৫-৬ ইঞ্চি	১০	
মৃগেল/কালিবাউস/কার্পিও	৫-৬ ইঞ্চি	৬	
মোট =		১০৬	১৫০ – ২০০

৩. মনোসেক্স তিলাপিয়া

মাছের প্রজাতি	সাইজ	মজুদ সংখ্যা (টি/শতাংশ)
তেলাপিয়া একক	১ – ১.৫ ইঞ্চি/৫ গ্রাম	২০০ - ৩০০
সিলভার/কাতলা/বিগহেড	৫-৬ ইঞ্চি	৫ - ১০

মজুদ ঘনত্ব :

৪. কৈ

মাছের প্রজাতি	সাইজ	মজুদ সংখ্যা (টি/শতাংশ)
কৈ একক	১ – ১.৫ ইঞ্চি/৫ গ্রাম	৪০০ - ৫০০
সিলভার/কাতলা/বিগহেড	৫-৬ ইঞ্চি	৫ - ১০

৫. শিং/মাগুর

মাছের প্রজাতি	সাইজ	মজুদ সংখ্যা (টি/শতাংশ)
শিং/মাগুর একক	১ – ১.৫ ইঞ্চি/৫-৭ গ্রাম	৬০০ - ৮০০
সিলভার/কাতলা/বিগহেড	৫-৬ ইঞ্চি	৫ - ১০

পোনা পরিবহন :

সুস্থ সবল পোনা প্রাপ্তির স্থান :

১. বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার
২. প্রাকৃতিক উৎস্য

ভাল পোনা চেনার উপায়:

পযবেক্ষণের বিষয়	ভাল পোনা	খারাপ পোনা
চলাফেরা	চঞ্চল	দুবল
আইশ	ঝকঝকে	ফিকে
বিজলি	পিচ্ছিল	খসখসে
শরীরে দাগ	কোন দাগ নেই	দেহ, পাখনা ও ফুলকায় লাল দাগ
অবস্থান	পানির গভীরে	পানির উপরিভাগে
স্রোতে চলাফেরা	স্রোতের বিপরীতে	স্রোত বিহীন জায়গায় অবস্থান

রেণু ও পোনা পরিবহন পদ্ধতি :

১. আধুনিক পদ্ধতি – পলিথিন ব্যাগে (সাধারণত ৬০ * ৪০ সে.মি. আকার)

২. সনাতন পদ্ধতি – ড্রাম বা এলুমিনিয়ামের হাড়ি ।

পরিবহন ঘনত্ব :

১. কার্প – রেণু

পরিবহন ঘনত্ব	পরিবহন দূরত্ব
১২৫ -১৩০ গ্রাম/ব্যাগ	১২ – ১৫ ঘন্টা
২০০ গ্রাম/ ব্যাগ	৩-৪ ঘন্টা

২. কার্প – ধানী

আকার	পরিবহন ঘনত্ব	পরিবহন দূরত্ব
১.৫ সে.মি	১৫০০-১৬০০ টি/ব্যাগ	১২-১৫ ঘন্টা
২-২.৫ সে.মি	৫০০-৬০০ টি/ব্যাগ	১২-১৫ ঘন্টা
৩ সে.মি	৩৩০-৩৫০ টি/ব্যাগ	১০-১২ ঘন্টা
২.৫ সে.মি	৫০-৬০ টি/ব্যাগ	২০-২৪ ঘন্টা

আধুনিক পদ্ধতিতে পোনা পরিবহন পদ্ধতি :

রেণু ও ধানী

↓

দুই ঘন্টা খাদ্য সরবরাহ বন্ধ
(মল ত্যাগ করে, পরিপাকের জন্য অক্সিজেনের প্রযোজন হয়,
বমি করে, মল ত্যাগ করার ফলে ইউরিক এসিড থাকে ফলে পানি দূষিত হয়ে মাছ মারা যেহে পারে)

↓

পলিথিন ব্যাগে প্যাকিং
(১/৪ অংশ পানি + ৩/৪ অংশ অক্সিজেন)

↓

গন্তব্য স্থানে সাবধানতার সাথে পরিবহন

পোনা পরিবহনে সর্তকতা :(বাটা, পুটি, মিরর কার্প পুল ব্রিডিং করানো যায়)

১. ব্যাগে যাতে কোন চাপ না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে ।

২. টিনের টুকরা, পেরেক বা অন্য কোন শক্ত বস্তুর আঘাত না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে ।

৩. ব্যাগ বা পাতিল ছায়যুক্ত স্থানে রাখতে হবে ।

৪. পরিবহন পাত্র ভেজা কাপড় বা চট দ্বারা ঢেকে রাখতে হবে ।

৫. পাতিল বা ড্রামে পরিবহনের ক্ষেত্রে পাত্রের পানি আন্দোলত করতে হবে ।

৬. মৃত মাছ সাথে সাথে অপসারণ করতে হবে ।

পোনা ছাড়া :

১. পোনা টেকসই করন :

পোনার ব্যাগ ৩০ মিনিট পানিতে ভাসিয়ে রাখা

↓

ব্যাগের ভিতরের পানি ও পুকুরের পানি অদলবদল করা

↓

তাপমাত্রা সমান হলে পোনা ছাড়া

৩. পোনা ছাড়ার সময়:

ক) সকালে অথবা বিকালে

খ) কড়া রোদে, মেঘলা দিন বা বৃষ্টির মধ্যে
পোনা ছাড়া উচিত নয়

২. পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা :

পুকুরে হাপা স্থাপন

↓

হাপায় পোনা ছাড়া

↓

২৪ ঘন্টা অপেক্ষা

↙ ↘

পোনা মারা গেলে → পানি বিষাক্ত

পোনা মারা না গেলে → পানি বিষমুক্ত

৮. মাছের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

সম্পূরক খাদ্য :

মাছের অতিরিক্ত উৎপাদন পাওয়ার লক্ষ্যে পুকুরে বিদ্যমান প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি বাহির থেকে যে খাদ্য সরবরাহ করা হয় তাই সম্পূরক খাদ্য ।

সম্পূরক খাদ্য দুই প্রকার :

১. পিলেট খাদ্য

২. দানাদার খাদ্য/বল খাদ্য

সম্পূরক খাদ্যের গুরুত্ব :

১. অধিক ঘনত্বে মাছ চাষ করা যায়

২. অল্প সময়ে মাছ বিক্রয় উপযোগী হয়

৩. মাছের মৃত্যু হার অনেকাংশে কমে যায়

৪. মাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়

৫. অল্প আয়তনের জলাশয় হতে অধিক উৎপাদন পাওয়া যায় ।

খাদ্য নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়:

১. উপাদানসমূহের সহজলভ্যতা

২ . মাছের পুষ্টি চাহিদা

৩. মাছের পছন্দনীয়

৪. উচ্চ খাদ্য পরিবর্তন হার

৫. চাষীর আর্থিক সংগতি

মাছের পুষ্টি চাহিদা :

প্রজাতি	আমিশ (%)	প্রজাতি	আমিশ (%)
রুই জাতীয় মাছ	২৫-২৬	পাঙ্গাস	৩০-৪০
কমনকার্প	৩৫-৪০	মাগুর	৩০-৩৫
তেলাপিয়া	২৫-৩৫	শিং	৩০-৪০
গ্রাসকার্প	২৩-২৮	গলদা চিংড়ি	৩৫-৪০

সম্পূরক (পিলেট) খাদ্য তৈরি

উপাদান

উপাদান (% আমিশ)	শতকরা হার	মিশ্রিত খাদ্যে আমিশের পরিমাণ
সরিষার খৈল (৩২)	৩০ %	২৫ – ৩০ %
মিট এন্ড বোন মিল (৫৫)	২০ %	
চাউলের কুড়া (১৬)	২৫ %	
গমের ভূষি/ভূট্রার ভূষি (১৬)	২৫ %	

পদ্ধতি

উপাদানগুলো গুড়া করে চালুনি দ্বারা চালা

↓

পাত্রে ভালভাবে মিশানো

↓ বাইন্ডার হিসাবে পরিমানমত আটা পানিতে গুলে দিলে ভাল

পিলেট মেশিনের সাহায্যে পিলেট বানানো

↓

রোদে শুকানোর পর ঠান্ডা করে সংরক্ষণ করা

সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ মাত্রা :

১. কার্প জাতীয় মাছ চাষ : প্রতিদিন মাছের দেহ ওজনের ৩-৫ % হারে প্রয়োগ করতে হবে ।

২. পাঙ্গাস চাষে :

মাছের আকার	প্রতিটি মাছের গড় ওজন (গ্রাম)	মাছের মোট ওজন অনুসারে খাদ্য প্রয়োগের হার	খাদ্য প্রয়োগের বেলা (দৈনিক)
রেণু	০.৫ – ৫ পর্যন্ত	৫০%	৪ বার
পোনা	৫০ পর্যন্ত	৮-১০%	৪ বার
আঙ্গুলি পোনা	৫০ – ১০০ পর্যন্ত	৬-৭%	৩ বার
বড় মাছ	১৫১-বাজারজাতকরণ পর্যন্ত	৩-৫%	২-৩ বার

৩. তেলাপিয়া চাষে :

মাছের আকার	প্রতিটি মাছের গড় ওজন (গ্রাম)	মাছের মোট ওজন অনুসারে খাদ্য প্রয়োগের হার	খাদ্য প্রয়োগের বেলা (দৈনিক)
রেণু	০.৫ – ৫ পর্যন্ত	৫০%	৪ বার
পোনা	৫০ পর্যন্ত	৮-১০%	৪ বার
বড় মাছ	৫০ - বাজারজাতকরণ পর্যন্ত	৩-৫%	২-৩ বার

৪. কৈ/শিং-মাগুর চাষে :

প্রতিটি মাছের গড় ওজন (গ্রাম)	মাছের মোট ওজন অনুসারে খাদ্য প্রয়োগের হার	খাদ্য প্রয়োগের বেলা (দৈনিক)
০.২ – ৫ পর্যন্ত	১০০%- ৩০%	৪/৫ বার
৬-৩০ পর্যন্ত	২৫%-৭%	৪/৫ বার
৩১ – ৬০ পর্যন্ত	৭%-৫%	৩-৪ বার
৬১- বাজারজাতকরণ পর্যন্ত	৫%-৪%	৩-৪ বার

খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ :

মজুদকৃত পোনার (প্রজাতি ভিত্তিক) সংখ্যা খাতায় লিপিবদ্ধকরণ

↓

প্রজাতি অনুযায়ী গড় ওজন নির্ণয়

↓

মাছের মোট ওজন নির্ণয়

↓

মোট ওজনের ভিত্তিতে দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ

যেমন – যদি কোন পুকুরে মজুদকৃত পোনার মোট ওজন ২০ কেজি হয় , তাহলে দৈনিক ৫% হারে খাদ্যের পরিমাণ হবে ১ কেজি ।

নমুনা সংগ্রহ :

প্রয়োজনীয়তা

↓

মাছের বৃদ্ধি ঘটছে কিনা দেখা

মজুদ মাছের পরিমাণ নির্ধারণ

রোগ বালাইয়ের প্রাদর্ভাব পরীক্ষা

↓

জাল টেনে মজুদকৃত মাছের ১০ ভাগ ধরা

↓

গড় ওজন নির্ণয়

↓

গড় ওজনকে মজুদকৃত মাছের সংখ্যা দিয়ে গুণ করে মোট ওজন নির্ণয়

↓

পরবর্তী সম্পূরক খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ

- খাদ্য প্রয়োগ কম/বেশি বা বন্ধ করতে হবে , যদি :
  ১. পুকুরের পানি ঘন সবুজ হয়
  ২. মেঘলা দিনে
  ৩. শীতকালে

সবুজ খাবার : সরপুটি ও গ্রাস কার্পের জন্য ।

বাশ বা অন্য কোন উপকরণ দিয়ে
তৈরি চার কোনা ভাসমান ফ্রেম তৈরি

ক্ষুদিপানা, কলাপাতা, নরম ঘাস, কলমি
শাক, মুলা শাক ইত্যাদি কেটে টুকরা করা

৩০ শতাংশ পুকুরের জন্য ১
বর্গমিটার

ফ্রেমের মধ্যে রাখা

পুকুরে স্থাপন

৯. মজুদ পরবর্তী সার ব্যবস্থাপনা

- পুকুরে প্রাকৃতিক খাবার কমে গেলে সার প্রয়োগ করতে হয় ।

সার প্রয়োগ মাত্রা:

সারের নাম	সারের পরিমান (গ্রাম/শাতাংশ/দিন)
ইউরিয়া	৫ (15)
টিএসপি	৩(20) (৭.৫)
কমপোস্ট	৩০০

ছবি-৭ ঃ পুকুরে ইউরিয়ার অর্ধেক টিএসপি দরকার

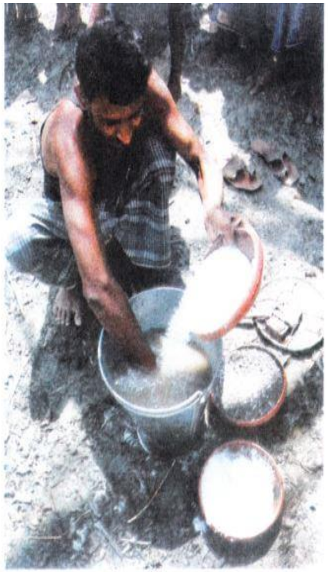
সার পানিতে গুলানো

সার প্রয়োগ পদ্ধতি:

সার প্রয়োগ সময়ের ১২ ঘন্টা আগে টিএসপি সার পানিতে ভিজানো

↓

সার প্রয়োগ সময়ের আধা ঘন্টা আগে ইউরিয়া ও টিএসপি এক সাথে পানিতে গুলানো

↓

সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটানো

সার প্রয়োগের সময় :

১. আলোক উজ্জ্বল দিনে

২. মেঘলা দিনে সার প্রয়োগ না করাই ভাল ।

৩. শীতকালে সার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হয় ।

সার প্রয়োগে সতর্কতা :

১. সেকি ডিস্ক রিডিং ২৫ সেমি এর কম হলে সার ব্যবহার করা উচিত নয় ◌্

২. ঘোলা পানিতে সার প্রয়োগ করা উচিত নয় । এতে সারের কার্যকারিতা কম হবে ।

৩. ইউরিয়া সার বাতাসে খোলা রাখলে কার্যকারিতা কম হবে ।

৪. আগাছা বেশী থাকলে সার দেওয়া উচিত নয় ।

৫. অম্লীয় মাটি/পানিতে সারের কার্যকারিতা কম

১০. আহরণ

১. আংশিক আহরণ
২. সম্পূর্ণ আহরণ

সময়মত বড় মাছ ধরা

মাছ আহরণের সাধারণ বিবেচ্য বিষয়গুলো হচ্ছে –

১.মাছের আকার এবং ওজন

কাতলা – ৫০০ গ্রাম বা তার বেশি

সিলভার, মিররকার্প, গ্রাসকার্প- ৭৫০ গ্রাম তার বেশি

রুই, মৃগেল – ২৫০ গ্রাম বা তার বেশি

চিংড়ি – ৪০ গ্রাম বা তার বেশি

২. বাজার দর

৩. ঝুঁকি

- আংশিক আহরণের পরপরই বড় পোনা পুনঃ মজুদ করতে হবে।

মাছ বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা :

১. মাছ ছায়াযুক্ত স্থানে রাখা

২. কোন রকম আঘাত/বিকৃত না হয় সেই দিকে খেয়ার রাখা

৩. বাজারজাতকরণের পূর্ব মহুর্তেই মাছ আহরণ করা

৪. মাছ ধরে প্রথমে হাপায় রাখা

৫. ব্যবস্থা থাকলে বরফে সংরক্ষণ করা যায়

৬. বাজার শুরুতেই যাতে মাছ বাজার উঠানো যায় সে বিবেচনা করে সময়মত মাছ ধরা ।

১১. মাছ চাষে ঝুঁকি সমূহ

১. বন্যা ও জলোচ্ছ্বাস

২. ক্ষতরোগ

৩. পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া/পানির স্বল্পতা

৪. চুরি

৫. শত্রুতামূলক বিষ প্রয়োগ ।

১২. মাছের সাধারণ রোগ ও তার প্রতিকার

রোগের কারণনসূহ :

১. পানির দূষিত পরিবেশ

২. মাছের অতিরিক্ত মজুদ

৩. অতিরিক্ত সার প্রয়োগ

৪. পানিতে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব

৫. অতিরিক্ত ক্ষতিকর গ্যাস

৬. অতিরিক্ত খাদ্য প্রয়োগ

৭. তলায় অতিরিক্ত পচা কাদা

৮. বৃষ্টির ধোয়া পানি/ পানির অতিরিক্ত ঘোলাত্ব

৯. আঘাত প্রাপ্ত হওয়া

১০. ব্যাকটেরিয়া, ফংগাস, প্রটোজোয়ার উপস্থিতি

রোগ প্রতিরোধ :

১. পুকুর জীবাণুমুক্ত করা ।

২. তলার অতিরিক্ত কাদা সরানো

৩. পুকুরে নিয়মিত চুন দিতে হবে

৪. পরিমান মত সার প্রয়োগ করতে হবে

৫. অতিরিক্ত পোনা মজুদ না করা

৬. বাইরের অবাঞ্ছিত প্রাণী ও পানি পুকুরে না ঢুকানো

৭. পুকুরে জাল ব্যবহারের পূর্বে জীবাণুমুক্ত করে নেয়া

৮. অতিরিক্ত সম্পূরক খাবার ব্যবহার না করা

৯. মাছ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে সরিয়ে ফেলা

১০. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি এমন প্রজাতির চাষ করা ।

রোগাক্রান্ত মাছের লক্ষণ :

১. মাছ অস্বাভাবিকভাবে পানির উপরে সাতার কাটতে থাকে

২. পুকুরে খাবার দিলে মাছ কম খায়

৩. মাছের গায়ের পিছ্লা বা আঠালো ভাবটি নষ্ট হয়ে যায় ।

৪. মাছের ফুলকার স্বাভাবিক লাল রং নষ্ট হয় ।

৫. কখনও মাছের গায়ে লাল , সাদা অথবা কালো দাগ দেখা যায় ।

৬. লেজ ও পিঠের পাখনা বা ফইরা পঁচে খসে পড়ে যেতে পারে ।

৭. পেট ফুলে পানি জমার মত মনে হতে পারে ।

৮. খুটি বা কোন কিছুকে গা ঘসতে দেখা যেতে পারে

মাছের কয়েকটি রোগ, লক্ষণ ও প্রতিকার

১. মাছের ক্ষতরোগ

কারণ:

- পানির পরিবেশ দূষণ
- ছত্রাক, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত

সময়:

- সাধারণত শীতকালে মাছের ক্ষতরোগ দেখা যায়

আক্রান্ত মাছ:

- সাধারণত পুটি, শোল, টাকি প্রভৃতি এবং পরবর্তীতে কার্প জাতীয় মাছে এ রোগ হয় ।

লক্ষণ :

- মাছের দেহের বিভিন্ন অংশে লালচে দাগ হয়ে ক্ষতের সৃষ্টি হয় ।

প্রতিকার :

- ১ কেজি চুন ও ১ কেজি লবণ গুলিয়ে দুই বারে প্রয়োগ করতে হবে ।
- আক্রান্ত মাছকে ৫ মিগ্রা/লিটার পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট বা ১০ গ্রাম/লিটার লবণ দ্রবণে ১-২ মিনিট গোসল করানো ।
- রোগা মাছ পুকুর থেকে তুলে ফেলা
- পুকুর শুকিয়ে জীবাণুমুক্ত করে নেয় ।

২. লেজ ও পাখনা (ফইরা) পঁচা রোগ

কারণ:

-পুকুরের তলায় অতিরিক্ত জৈব পদার্থ , ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ

সময় :

- সাধারণত গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে এ রোগ হয় ।

লক্ষণ:

- লেজ ও পাখনা পঁচে যেতে থাকে

- পাখনা ছিড়ে সাদা হয়ে যেতে থাকে ।

প্রতিকার:

- ১ গ্রাম তুতে/লিটা পানিতে কয়েক মিনিট গোসল করানো

৩. মাছের পেট ফোলা রোগ

লক্ষণ:

-মাছের পেটে পানি জমে । পেটে চাপ দিলে পানি বের হয় ।

- মাছর আইশগুলি খাড়া হয়ে যায় ।

প্রতিকার:

- আক্রান্ত মাছ তুলে ফেলা
- ১ গ্রাম/লিটার লবণ পানিতে গোসল করানো
- ১ গ্রাম ট্যারামইসিন ক্যাপসুলের গুড়া/কেজি খাবারের সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে ।

৪. মাছের উকুন :

কারণ:

-আরগুলাস, পুকুরের তলায় অতিরিক্ত জৈব পদার্থ,

ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ

আক্রান্ত মাছ:

-প্রাথমিকভাবে রুই, কাতলা, মৃগেল এবং পরে

অন্যান্য মাছ আক্রান্ত হয় ।

সময়:

প্রধানত: গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ।

লক্ষণ:

-মাছ অবিরাম ছুটাছুটি করে

- কোন কিছুর সাথে গা ঘষতে থাকে

- দেহ লাল বর্ণ ধারণ করে

- লক্ষ করলে আইশের উপর ক্ষুদ্রাকার উকুন দেখা যায় ।

প্রতিকার:

➢ মেজিক/রিপকর্ড = ৪০-৫০ মিলি/বিঘা/৪ফুট গভীরতা

➢ ডিপটারেক্স :

➢ সুমিথিয়ন: ২-৩ মিলি/শতাংশ/ফুট গভীরতা

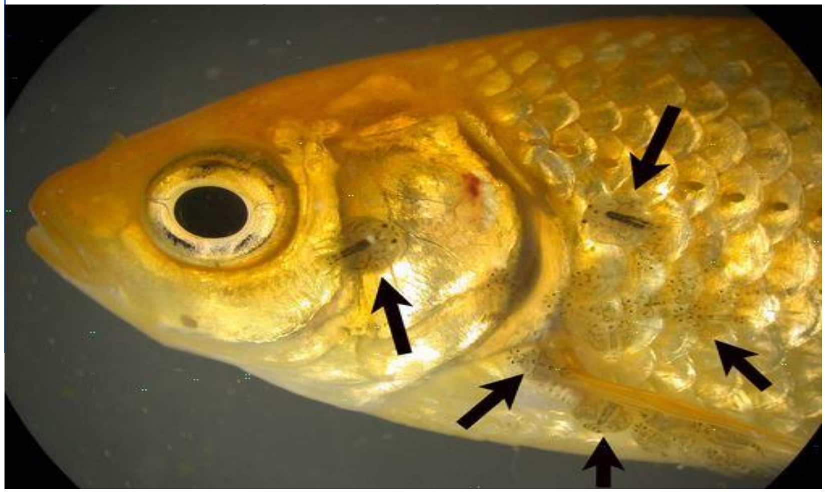

মাছ চাষ কতিপয় সমস্য ও তার প্রতিকার

প্রতি মাসে ২০০ গ্রাম/শতাংশ জিওলাইট দিলে সাধারণত কোন সমস্যা হবে না ।

১. খাবি খাওয়া বা অক্সিজেনের অভাব:

২. পানির উপর ঘন সবুজ স্তর (খাবার দেওয়া কমাতে হবে, সার দেওয়া যাবে না,

সিলভার কার্প ছাড়া, পানি প্রবেম করানো, চুন দেওয়া)

৩. পানির উপর লাল স্তর (২.৫ কেজি রসুন গুড়া করে

প্রতি বিঘায় দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়)

৪. পানির ঘোলাত্ব

৫. গ্যাস হলে : জিওলাইট ২০০ গ্রাম/শতাংশ, গ্যাস ট্র্যাপ

অক্সি এ = ৩০০-৪০০ গ্রাম/একর

সবুজ বৃদ্ধির জন্য পানির হার্ডনেস বাড়ানো প্রয়োজন জিপসাম ১কেজি +থিয়োবিট ১ কেজি/বিঘা?

ক্ষতরোগের সমাধান, টিমসেন = ২০ গ্রাম/বিঘা

১ কেজি লবণ + ১ কেজি চুন

অ্যাকুয়া প্লাস ৫ কেজি + ২৫০ গ্রাম চিনি+ ২৫০ গ্রাম চাউলের কুড়া ভিজিয়ে /একর ৫-৬ ঘন্টা পর রৌদ্রের সময় পুকুরে দিতে হবে ।তাহলে মাছ বাসবে না

ব্লিচিং পাউডার মাছ থাকা অবস্থায় ১-১.৫ কেজি প্রতি বিঘা এএবং মাছ না থাকলে ৫-৬ কেজি প্রতি বিঘায় জীবাণু মুক্ত করার জন্য

ধন্যবাদ